**ATMADEEP**

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
**ISSN: 2454–1508**
**Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)**
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 161-166
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
**DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.192**

# জীবন জিজ্ঞাসা: ভারতীয় দর্শনের আলোকে একটি দার্শনিক বিশ্লেষণ

**ড. মৈত্রী গোস্বামী,** *স্বাধীন গবেষক, ঊষাগ্রাম, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 27.09.2025; Accepted: 28.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author (s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

**Abstract**

It is undoubtedly true that the Indian Philosophy explores deep questions about life and the world. The great thinkers of India across centuries have tried to enquire regarding the following questions, what is the nature of existence? what is the source of suffering (duḥkha)? how can suffering be overcome? what is the ultimate reality? These questions have been answered in many ways, leading to a variety of philosophical traditions. In this regard we can say that the orthodox (āstika) schools of Indian Philosophy like Nyāya, Vaiśeṣika, Sāṃkhya, Yoga, Pūrva-Mīmāṃsā, and Vedānta—analyze the reality through logic, metaphysics, and spiritual discipline. And the heterodox (nāstika) schools of Indian Philosophy like Buddhism, Jainism, and Cārvāka—offer alternative explanations and rejected Vedic authority. The schools of Indian Philosophy proposed unique paths for the cessation of suffering and the attainment of liberation (mokṣa). We can see that, their methods differ, but all these systems share a common aim to make human beings understand the meaning of life, confront suffering, and move toward truth, knowledge, and liberation (mokṣa). This article offers a brief outline of the above discussion as discussed by the schools of Indian Philosophy. In this regard the article will focus the fundamental questions of existence and will show the diversity of answers to reach the intellectual depth and inclusivity of Indian thought.

**Keywords:** Sorrow, Cessation of sorrow, Means of cessation of sorrow, Liberation (moksha), God

ভারতবর্ষ বৌদ্ধিক সাধনার তীর্থক্ষেত্র। যুগে যুগে এই পুণ্যভূমিতে আবির্ভূত হয়েছেন স্থিতধী মুনি, ঋষিগণ। তাঁদের আত্মচেতনার দ্বারা উপলব্ধ সত্যের উপর ভর করেই ভারতবর্ষের অধ্যাত্মচেতনার পথ প্রশস্ত হয়েছে, রচিত হয়েছে ধর্ম, দর্শন ও আধ্যাত্মিকতার মেলবন্ধন। যার ফলশ্রুতি হল ভারতীয় দর্শন। ভারতীয় দর্শনে গভীর চিন্তার অনুশীলনের মধ্য দিয়ে জীবনবোধে পূর্ণ ভারতীয় ঐতিহ্যের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। ভারতীয় দর্শনচর্চার সূত্রপাত বেদের ওপর ভিত্তি করে হলেও বেদকে কেন্দ্র করে মতানৈক্যও পরিলক্ষিত হয়েছে। বেদকে কেন্দ্র করে মতানৈক্য ভারতীয় দর্শন চর্চাকে দুটি ধারায় বিভক্ত করেছে। এই দুটি ধারা আস্তিক ও নাস্তিক নামে পরিচিত। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে আস্তিক ও নাস্তিক ধারা দুটি যে অর্থে আলোচিত হয় তা প্রচলিত অর্থের থেকে ভিন্ন। প্রচলিত অর্থে ঈশ্বরে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের বিষয়টিকে কেন্দ্র করে আস্তিক ও নাস্তিক ধারার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। বেদের স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করে আস্তিক ও নাস্তিক এই দুটি ধারার মধ্যে মতপার্থক্য থাকলেও জগৎ ও জীবন সম্বন্ধীয় জিজ্ঞাসায় তাঁদের আলোচনার ধারার গভীরতা আজও যেকোন জ্ঞান পীপাসু ব্যক্তিকে আকর্ষণ করে। ভারতীয় দর্শন

সম্প্রদায়গুলির মধ্যে জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য রয়েছে ঠিকই, কিন্তু উক্ত সম্প্রদায়গুলির প্রতিটিই স্ব স্ব দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী জগৎ ও জীবন জিজ্ঞাসার সহজ সরল ও বহুমুখী সমাধান অন্বেষণ করেছেন। আর সেকারণেই ভারতীয় দর্শনে জগৎ ও জীবনের বিচিত্র জিজ্ঞাসা ও সেই জিজ্ঞাসার নিরসনকল্পে বহুমুখী অনুসন্ধান প্রক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় হিসেবে স্থান পেয়েছে। এই আলোচনায় পরমতত্ত্ব বিষয়ক, ঈশ্বর বিষয়ক, জগত অতিবর্তী আধ্যাত্মিক আলোচনা যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি কার্যকারণতত্ত্ব, জড়বাদ, সুখবাদ ইত্যাদি নানা দার্শনিক তত্ত্বও স্থান পেয়েছে আলোচ্য বিষয় হিসেবে, যেগুলির সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের নানা জিজ্ঞাসার বহুমুখী সমাধান ব্যক্ত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধটি ভারতীয় দর্শনের আলোকে জীবন জিজ্ঞাসা বিষয়ক অতিসংক্ষিপ্ত একটি পর্যালোচনা করার প্রয়াস মাত্র। তবে এপ্রসঙ্গে যে কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন তা হল, বর্তমান প্রবন্ধটি একান্তভাবে উক্ত মতবাদগুলি বিষয়ক না হলেও প্রাসঙ্গিক স্থলে ভারতীয় দর্শনের উক্ত তত্ত্বগুলির আলোচনার ধারাকে উপজীব্য করেই আলোচনার বিস্তার ঘটানো হবে।

মানুষের জগৎ ও জীবন-এর রহস্য বিষয়ে প্রশ্ন করার একটি স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে। এই জীবন জিজ্ঞাসায় মানুষকে 'কোঽহম্' (আমি কে?) থেকে 'সোঽহম্' (আমিই সে) এর উপলব্ধিতে পৌঁছে দিয়েছে। আর এই যাত্রাপথের মধ্য দিয়ে জন্ম হয়েছে ভারতীয় দর্শনের। এই দর্শন পরম্পরায় পরিলক্ষিত হয় নানা বৈচিত্র্যের। বেদবিরোধী ও বেদানুসারী, জড়বাদী, ভাববাদী, ভোগবাদী ও পরহিতবাদী— এই মতগুলির দার্শনিক অবস্থান পরস্পর পরস্পরের বিরোধী হিসেবে পরিচিতি পেলেও এগুলি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে একে অপরের সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে। বলা যেতে পারে যার পরিণতি হল ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতির। তাই ভারতীয় দর্শন চিন্তায় বহুমুখী ও বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও একটি ঐক্যকে সুস্পষ্ট ভাবে সূচিত করে। এই ঐক্যের বিষয়টি হল জীবন ও জগতের প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী। বর্তমান গবেষণামূলক নিবন্ধে ভারতীয় দর্শন চিন্তার এই দিকটিও বিশ্লেষিত হবে।

দৃশ্ ধাতুর সাথে অনট্ প্রত্যয় যোগে 'দর্শন' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে। ব্যুৎপত্তিগতভাবে 'দর্শন' শব্দটির অর্থ হল দেখা। তবে এই দেখা জীবনকে দেখা যা এক গভীর জীবনবোধের উপলব্ধি। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে জগৎ ও জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতায় জন্ম দিয়েছে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদের। মতবাদগুলি ভিন্ন ভিন্ন এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ হলেও তা থেকেই রচিত হয়েছে বৈচিত্র্যময় ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতির। তাই বলা যেতে পারে বৈদিক যুগ থেকে ভারতবর্ষের কৃষ্টিতে, ঐতিহ্যে বা সংস্কৃতিতে যা প্রবহমান তাই ভারতবর্ষের দর্শন বা ভারতীয় দর্শন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারতীয় দর্শন বেদের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে, তবে সকল দর্শন সম্প্রদায় যে বেদের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেন তা নয়। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় বেদের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করেছেন তাঁরা নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায় বা বেদনিন্দুক সম্প্রদায় নামে পরিচিত। এপ্রসঙ্গে মহর্ষি বৃহস্পতির বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বেদ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিন শ্রেণীর লোক বেদের রচয়িতা, যথা ভণ্ড, ধূর্ত্ত ও নিশাচর।[১] আবার তাঁদের এরূপ বক্তব্যও পাওয়া যায় যে, অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞ, ত্রিবেদ ও ভস্মলেপন এগুলি বুদ্ধি ও পৌরুষহীন লোকেদের জীবিকা অর্জনের উপায় মাত্র।[২] নাস্তিক চার্বাক দর্শনে ছত্রে ছত্রে বেদের বিরোধিতা পরিলক্ষিত হলেও বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে কিন্তু সেই প্রভাব কিছুটা নমনীয়। নাস্তিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত হলেও বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে মানব জীবনের মূল লক্ষ্যে পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বা সুনিয়ন্ত্রিতভাবে জীবনযাপন করার জন্য যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ ও পঞ্চমহাব্রতের কথা বলা হয় তা যে পুরোপুরি বৈদিক ভাবধারা রহিত একথা বলা যায় না। বৈদিক সাহিত্যে কায়িক, বাচিক, মানসিক হিংসা থেকে বিরত থাকার উপদেশ সর্বত্র পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকেও বৌদ্ধ বা জৈন দর্শনের অহিংসা তত্ত্ব বেদানুসারী বলা যায়।

ভারতীয় দর্শন চর্চার সূত্রপাত জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের মধ্য দিয়ে। 'আমি কে?'-এই জিজ্ঞাসা থেকে যাত্রাপথ শুরু করে সুখ কী? দুঃখ কী? সুখ ও দুঃখ এর প্রভেদ কী? এই প্রভেদ কি আদৌ বর্তমান? দুঃখ থেকে পরিত্রাণের

---

১ "ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারঃ ভণ্ডধূর্ত্তনিশাচরাঃ", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

২ "অগ্নিহোত্রং ত্রয়োবেদাস্ত্রিদণ্ডং ভস্মগুণ্ঠনম্।", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৩৫।

উপায় কী? ইত্যাদি জীবন কেন্দ্রিক নানা প্রশ্ন এবং তার উত্তর অনুসন্ধান দার্শনিক মনকে জিজ্ঞাসু করে তুলেছে। এই জিজ্ঞাসাগুলি ভারতীয় দর্শনচর্চার রসদ জুগিয়েছে। যার ফলশ্রুতি হল বহুরূপী ও বহুমুখী ভারতীয় দার্শনিক সংস্কৃতি।

এই বহুমুখী চর্চার একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল মানব জীবনের দুঃখ ও তার নিবৃত্তির উপায় নির্দেশ। সুখবাদী চার্বাক ব্যতীত অন্যান্য সকল দর্শন সম্প্রদায় দুঃখ বিষয়ে গভীর আলোচনা করেছেন। অতিসংক্ষেপে বিভিন্ন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় কর্তৃক আলোচিত দুঃখ বিষয়ক আলোচনা করা যেতে পারে এভাবে। প্রথমেই প্রাচীন ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় সাংখ্য দর্শনের আলোচনা করা যেতে পারে। বাচস্পতি মিশ্র তাঁর *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* গ্রন্থে দুঃখের অস্তিত্ব প্রসঙ্গে বলেছেন, "...প্রতিকূলবেদনীয়ত্বং..."[৩]। বাচস্পতি মিশ্রের এই বক্তব্য অনুযায়ী প্রতিকূলরূপে দুঃখের বোধ হয়, যা প্রত্যক্ষ অনুভবেই লব্ধ। এছাড়াও আপ্তবচনরূপে দুঃখের স্বীকৃতি তো আছেই। ঈশ্বরকৃষ্ণ প্রণীত *সাংখ্যকারিকায়* ব্যবহৃত "দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা...."[৪] এই পদগুলির মাধ্যমেও দুঃখের অস্তিত্বসূচক বার্তা রয়েছে। বাচস্পতি মিশ্র দুঃখ বিষয়ক আলোচনায় একথাও বলেছেন যে, "এবং হি শাস্ত্রবিষয়ো ন জিজ্ঞাস্যেত, যদি দুঃখং নাম জাগতি ন স্যাৎ"।[৫] অর্থাৎ জগতে দুঃখ বলে যদি কিছু না থাকত তাহলে শাস্ত্র বিষয়ক জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হত না।

ন্যায় দর্শনে স্বীকৃত দ্বাদশ প্রমেয়ের একটি অন্যতম প্রমেয় হল দুঃখ। ন্যায়সূত্রকার মহর্ষি গৌতম দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "বাধনালক্ষণং দুঃখম্"।[৬] সূত্রে উল্লিখিত 'বাধনা' শব্দের অর্থ প্রসঙ্গে ভাষ্যকার বলেছেন, দুঃখ, পীড়া ও তাপ এগুলি সমার্থক। এই অর্থ অনুসারে যা জীবের প্রতিকূল রূপে অনুভূত হয় তাই দুঃখ। এপ্রসঙ্গে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়নের বক্তব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, তা হল "সোঽয়ং সর্ব্বং দুখেনানুবিদ্ধমিতি....."।[৭] ভাষ্যকারের এই বক্তব্যকে অনুসরণ করে বলা যায়, দুঃখের দ্বারা অনুবিদ্ধ বা অনুষক্ত যা কিছু সবই দুঃখ। ন্যায় দর্শনের সমানতন্ত্র দর্শনরূপে পরিচিত বৈশেষিক দর্শনেও দুঃখকে প্রতিকূল অনুভব বলা হয়েছে। এর প্রমাণ পাওয়া যায় প্রশস্তপাদভাষ্যে। ভাষ্যকার প্রশস্তপাদ তাঁর ভাষ্যে দুঃখের লক্ষণ প্রসঙ্গে বলেছেন, "উপঘাতলক্ষণং দুঃখম্।"[৮] ভাষ্যে উল্লিখিত 'উপঘাত' শব্দের অর্থ হল যার দ্বারা ব্যক্তি উপহত বা ব্যথিত হত। অর্থাৎ যা ব্যক্তির প্রতিকূল তাই দুঃখ।

বৌদ্ধ দর্শনে যে চতুর্বিদ্ধ আর্য সত্যের কথা বলা হয় তার প্রথমটিই হল দুঃখ। অপর তিনটি আর্যসত্যগুলিও দুঃখকেন্দ্রিক। দুঃখের কারণ, দুঃখ নিরোধ ও দুঃখ নিরোধ মার্গ।[৯] গৌতম বুদ্ধের উপলব্ধ সত্য 'জীবন দুঃখময়'। কিন্তু তিনি দুঃখেই থেমে যাননি। যার প্রমাণ উপরে উল্লেখিত অপর তিনটি আর্যসত্য। বৌদ্ধ দর্শনের একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ *ধম্মপদের* বিভিন্ন বগ্গের একাধিক গাথায় দুঃখ বিষয়ক বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। *ধম্মপদে* জন্মগ্রহণ করাই যে দুঃখ সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে জরা বগ্গের অষ্টম গাথায়। এপ্রসঙ্গে ঐ গাথায় বলা হয়েছে "*দুক্খা জাতি পুনপ্পুনং*"।[১০] অর্থাৎ, পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ দুঃখের। জন্ম গ্রহণের ফলেই মানুষকে দুঃখ ভোগ করতে হয় এবং আমৃত্যু দুঃখ চলতে থাকে। জীবন দুঃখময় তবে জন্ম-জন্মান্তরে দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার প্রয়াস মানুষকে মুক্তিকামী করে তোলে বা দুঃখের আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসার উপায় অনুসন্ধানে ব্রতী করে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় গৌতম বুদ্ধ কথিত চতুর্থ আর্যসত্যের কথা যা দুঃখমুক্তির উপায় বিষয়ক। এপ্রসঙ্গে পুনরায় *ধম্মপদের* মার্গ বগ্গের কথা বলা যেতে পারে। এই বগ্গে দুঃখমুক্তির উপায় হিসেবে অষ্টাঙ্গিক মার্গের উল্লেখপূর্বক বলা হয়েছে-

---

৩ *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, বাচস্পতি মিশ্র, *সাংখ্যকারিকা এবং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৫৪।

৪ *সাংখ্যকারিকা*, ঈশ্বরকৃষ্ণ, *সাংখ্যকারিকা এবং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ১৭।

৫ *সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী*, বাচস্পতি মিশ্র, *সাংখ্যকারিকা এবং সাংখ্যতত্ত্বকৌমুদী* (প্রথম খণ্ড), রজত ভট্টাচার্য্য কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৫৩ থেকে উদ্ধৃত।

৬ *ন্যায়সূত্র*, মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন*, ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ২৩১।

৭ *ন্যায়ভাষ্য*, বাৎস্যায়ন, ঐ।

৮ *প্রশস্তপাদভাষ্য*, প্রশস্তপাদ, *প্রশস্তপাদভাষ্যম্*, দীননাথ ত্রিপাঠী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৪৩৬।

৯ "আর্য্যসত্যাখ্যয়া তত্ত্বচতুষ্টয়মিদং ক্রমাৎ।। দুঃখমায়তনং চৈব ততঃ সমুদয়ো মতঃ।", *সর্বদর্শনসংগ্রহ*, সায়ন মাধবাচার্য, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ*, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৬৯।

১০ *ধম্মপদ*, চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৭৭।

*"মগ্গানট্ঠঙ্গিকো সেট্ঠো"*। অষ্টাঙ্গিক মার্গের শ্রেষ্টত্ব বিষয়ে বলা হয়েছে মার্গসকলের মধ্যে অষ্টাঙ্গিক মার্গ শ্রেষ্ঠ।[১১] আবার ধম্মপদের বুদ্ধ বগ্গে বলা হয়েছে *"যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সঙ্ঘঞ্চ সরণং গতো, চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপ্পঞ্ঞায় পস্সতি। দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং, অরিয়ঞ্চট্ঠঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং। এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং, এতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খো পমুচ্চতি"*। যদি কোন ব্যক্তি বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের শরণ নেয়, দুঃখ, দুঃখের কারণ ও দুঃখের উপশমকারী অষ্টাঙ্গিকমার্গ এই আর্য্য সত্য চতুষ্টয় সম্যক্ জ্ঞানের আলোতে অবলোকন করে তাহলে এটিই নিরাপদ ও উত্তম আশ্রয়। এবং এই আশ্রয় অবলম্বন করলে দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব।[১২]

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখনিরোধ মার্গ রূপে উল্লেখিত অষ্টাঙ্গিক মার্গগুলি হল, সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল্প, সম্যক্ বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ আজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ স্মৃতি ও সম্যক্ সমাধি। গৌতম বুদ্ধ বর্ণিত এই মার্গের মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষ দৈনন্দিন জীবন যাত্রাকে উপেক্ষা না করে কীভাবে জ্ঞান এবং সঠিক কর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে নির্বাণ অর্থাৎ দুঃখ মুক্তির পথে অগ্রসর হতে পারে তার সুস্পষ্ট নির্দেশ পরিলক্ষিত হয়।

যদিও পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চার্বাক দর্শন ব্যতীত সকল ভারতীয় দর্শনে দুঃখ বিষয়ক আলোচনা পরিলক্ষিত হয়, তবুও একথা বলতেই হয় যে, চার্বাক দর্শনে যে দুঃখকে সর্বতভাবে অস্বীকার করা হয়েছে এমন নয়। জড়বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁরাও দুঃখ ও দুঃখ থেকে পরিত্রাণের কথা বলেছেন। চার্বাক দর্শনে শাস্তি থেকে প্রাপ্ত দুঃখ থেকে দূরে থাকার কথা বলা হয়েছে। এই শাস্তি হল রাষ্ট্রের নিয়ম ভঙ্গ করার শাস্তি।[১৩]

মনুষ্য জীবনের দুঃখময়তা মান্যতা পেলেও, দুঃখমুক্তির উপায় অন্বেষণ ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিলক্ষিত হয়। এবং এই লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায় ভিন্ন ভিন্ন পথকে বেছে নিয়েছেন। এই ভিন্নতার কারণ হিসেবে বলা যায় তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। ভারতীয় দর্শনে দুঃখ বিষয়ক আলোচনা কোনো মতবাদ নয় বরং তা বাস্তবতা বা অনিবার্য সত্য রূপে জীবন ধারণের সঙ্গে যুক্ত। বলা যেতে পারে ভারতীয় দর্শন দুঃখের উপস্থিতিকে অনিবার্য সত্য রূপে স্বীকৃতি দিয়ে দুঃখ নিবৃত্তির উপায় অনুসন্ধানে প্রয়াসী। উক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলি দুঃখ বিষয়ক আলোচনার পাশাপাশি দুঃখ মুক্তির উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। উপরে উল্লেখিত বৌদ্ধ দর্শনের দুঃখমুক্তি বিষয়ক আলোচনা একথার প্রামাণ্য দলিল।

এ প্রসঙ্গে বলা যায় সাংখ্য দর্শনেও দুঃখ নিবৃত্তি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। বাহুল্য বর্জনের তাগিদে সংক্ষেপে সাংখ্য দর্শনে উল্লেখিত দুঃখ নিবৃত্তির ত্রিবিধ উপায়ের কথা বলা যেতে পারে এভাবে। দৃষ্ট বা লৌকিক উপায়, আনুশ্রবিক বা বৈদিক যাগযজ্ঞাদি ও ব্যক্তাব্যক্তজ্ঞবিজ্ঞানাৎ অর্থাৎ ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর ভেদ জ্ঞান। এর মধ্যে তাঁরা ব্যক্ত, অব্যক্ত ও জ্ঞ এর ভেদ জ্ঞানকে শ্রেষ্ঠ উপায় বলে মান্যতা দিয়েছেন। যোগ দর্শনেও সমাধি স্তরে উন্নীত হওয়ার উপায়রূপে বা সুখ-দুঃখহীন অবস্থায় স্থিত হওয়ার জন্য অষ্ট যোগাঙ্গ অনুশীলনের কথা বলা হয়।

জৈন দর্শনে কর্মকেই জীবের বন্ধনের কারণ বলা হয়েছে। এই বন্ধন দশা থেকে মুক্তির উপায় রূপে সম্যক্ দর্শন, সম্যক্ জ্ঞান ও সম্যক্ চরিত্র পালনের কথা বলা হয়েছে।[১৪] এছাড়াও মোক্ষ লাভের সহায়ক রূপে পাঁচটি কর্মের কথা বলা হয়েছে, যথা অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য ও অপরিগ্রহ যা জৈন দর্শনে পঞ্চমহাব্রত নামে পরিচিত। ন্যায় দর্শনে মোক্ষকে অপবর্গ বলা হয়েছে। ন্যায়সূত্রে দুঃখ নামক প্রমেয়ের আলোচনার পরই অপবর্গ নামক প্রমেয়ের আলোচনা করা হয়েছে। অপবর্গ প্রসঙ্গে সূত্রকার মহর্ষি গৌতম বলেছেন, "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ"।[১৫] সূত্রে উল্লিখিত পদ

---

[১১] *ধম্মপদ,* চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ১৩৩।

[১২] *ধম্মপদ,* চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৯৬-৯৭।

[১৩] "A man can do anything—beg, borrow, steal or murder—in order to have more wealth and more pleasure. But the state laws prevent a man from doing whatever he likes and punishes him when he disobeys them. If he is clever enough to circumvent them, then his action is justified. Otherwise, he should follow them to avoid the pain of punsishment.", The Philosophical Traditions of India, P.T. Raju, page 92.

[১৪] "সম্যগ্দর্শনজ্ঞানচারিত্রাণি মোক্ষমার্গঃ", *সর্বদর্শনসংগ্রহ,* সায়ন মাধবাচার্য, সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ, সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৮৫।

[১৫] *ন্যায়সূত্র,* মহর্ষি গৌতম, *ন্যায়দর্শন,* ফণীভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ২৩৩।

অনুসারে এর অর্থ হয়, 'তার' থেকে অর্থাৎ দুঃখ থেকে অত্যন্ত বিমোক্ষ বা মুক্তিই হচ্ছে অপবর্গ। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে, 'তদ্' বা তার বলতে এখানে কার কথা বোঝানো হয়েছে? এর উত্তরে ভাষ্যকার স্পষ্টত বুঝিয়ে দিয়েছেন এখানে তদ্ বলতে দুঃখকে বোঝানো হয়েছে। দুঃখের আত্যন্তিক মুক্তি অপবর্গ। ন্যায় দর্শনে ষোড়শ পদার্থের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তি লাভের সহায়ক বলা হয়েছে। ভারতীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে বৈশেষিক দর্শন ন্যায় দর্শনের সমানতন্ত্র। বৈশেষিক দর্শনে পদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যের তত্ত্বজ্ঞানকে নিঃশ্রেয়সের হেতু বলা হয়েছে।[১৬] এখানে দ্রব্য, গুণ কর্ম, সামান্য, বিশেষ এবং সমবায় এই ছয়টি পদার্থের সাধর্ম্য ও বৈধর্ম্যের কথা বলা হয়েছে।

উক্ত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টতঃ বলা যায় যে ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলি দুঃখকে স্বীকৃতি দিলেও তাঁরা দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। মুক্তি বা মোক্ষ লাভের উপায় রূপে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান, বৈরাগ্য, চিত্তশুদ্ধি ও আত্মচেতনা বিকাশের কথা বলা হয়েছে। তাই ভারতীয় দর্শনে মোক্ষ বা মুক্তি অজ্ঞানতা দূরীকরণের পাশাপাশি, গভীর আধ্যাত্মিক ও নৈতিক সাধনা, যা ব্যক্তিকে সংসারবন্ধন থেকে মুক্ত করে তার প্রকৃত সত্তার স্বরূপ উপলব্ধির দিকে পরিচালিত করে।

এ প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি স্বাভাবিকভাবে ওঠে, তা হল জীবন জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে ঈশ্বর কি শুধুমাত্র কৌতুহল না কি পরম সত্তারূপে ঈশ্বরের কোন ভূমিকা আছে? জাগতিক নানা জিজ্ঞাসার মতোই ঈশ্বর বিষয়ক চিন্তাও ভারতীয় দার্শনিকদের আলোচনার বিষয় হিসেবে অগ্রাধিকার পেয়েছিল। বলা যেতে পারে পরম সত্তা হিসেবে ঈশ্বর না সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বর ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপনের মধ্য দিয়েই জগত ও জীবন বিষয়ক আলোচনায় ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব বিষয়ক আলোচনায় প্রবেশের অবকাশ এসে পড়ে। ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বর কখনো জগত স্রষ্টা, কখনো বা মুক্তির পথ প্রদর্শক, কখনো বা আবার কল্পনা মাত্র। কখনো বা কোনো ব্যক্তিই হয়ে উঠেছে ঈশ্বর সমতুল্য। ভারতীয় নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়গুলি ঈশ্বরকে অস্বীকার করেন। তবে এপ্রসঙ্গে বিশেষভাবে বলতে হয় উক্ত দর্শন সম্প্রদায়গুলিতে যে ঈশ্বর প্রসঙ্গ নেই তা কিন্তু নয়। জড়বাদী চার্বাক দর্শনে দেশের রাজা হলেন ঈশ্বর। অপরদিকে বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনে জগতের সৃষ্টিকর্তা রূপে ঈশ্বর স্বীকৃত না হলেও গৌতম বুদ্ধ এবং অর্হৎ ব্যক্তিকে এখানে ঈশ্বররূপে মর্যাদা প্রদান করা হয়।[১৭] তাঁদের মতে সিদ্ধ পুরুষের ধ্যান ও উপাসনা দুঃখ থেকে মুক্তি বা মোক্ষ লাভের সহায়ক। সিদ্ধপুরুষের ধ্যান সাধারণ জীবের চারিত্রিক শুদ্ধতা এনে দেয়। সুতরাং মোক্ষলাভের জন্য ঈশ্বর রূপে কোনো অতিরিক্ত সত্তা স্বীকার করার প্রয়োজন নেই।

আবার একথাও ঠিক যে সকল আস্তিক দর্শন সম্প্রদায় যে ঈশ্বরকে স্বীকার করেছেন এমন নয়। যেমন সাংখ্য ও মীমাংসা দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত নয়। সাংখ্য দর্শনে পুরুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে জগৎ এর ব্যাখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে ঈশ্বরের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয়েছে। মীমাংসা দর্শনেও ঈশ্বরকে অস্বীকার করা হয়, বেদ ও বৈদিক যাগযজ্ঞাদি এখানে মোক্ষ লাভের সহায়ক। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় যোগ দর্শনের কথা। ভারতীয় দর্শনে সাংখ্য দর্শনের সমানতন্ত্র রূপে পরিচিত হলেও যোগ দর্শনে ঈশ্বর স্বীকৃত। যোগ দর্শনে মোক্ষ লাভের সহায়ক উপায় রূপে ঈশ্বর প্রণিধানের কথা বলা হয়েছে। এই ঈশ্বর প্রণিধান একপ্রকার ভক্তি। এখানে যোগসূত্রকার মহর্ষি পতঞ্জলি ঈশ্বর প্রণিধানের মাধ্যমে ঈশ্বরের উপাসনা এবং ঈশ্বরে সকল কর্ম সমর্পণের কথা বলেছেন।[১৮]

ন্যায় দর্শনে ঈশ্বরের অস্তিত্বের স্বপক্ষে নানা যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে। ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর হলেন জগতের সৃষ্টিকর্তা। আবার তাঁদের মতে জীব কর্ম অনুযায়ী পাপ-পুণ্যের অধিকারী হয়। এই পাপপুণ্যের সমষ্টি ন্যায় দর্শনে অদৃষ্ট বলে পরিচিত। অদৃষ্টের নিয়ন্ত্রক রূপেও ন্যায় দর্শনে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্ব শক্তিমান সত্তারূপে স্বীকৃত।

এই আলোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে ভারতীয় দর্শনে ঈশ্বরতত্ত্ব বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। কোন ক্ষেত্রে মুক্তির অনুপ্রেরণা, কোন ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা, আবার কোথাও কর্ম ফলের নিয়ন্ত্রক। ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা অপ্রয়োজনীয় এই আলোচনাও ভারতীয় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে পরিলক্ষিত হয়। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে সেই আলোচনা না

---

[১৬] *প্রশস্তপাদভাষ্য,* প্রশস্তপাদ, বৈশেষিক দর্শন, প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল, পৃষ্ঠা ৩১ থেকে উদ্ধৃত।

[১৭] "সর্ব্বজ্ঞো জিতরাগাদিদোষ ত্রৈলোক্য পূজিতঃ। যথাস্থিতার্থবাদী চ দেবোহর্হৎ পরমেশ্বরঃ।।", *আপ্তনিশ্চয়ালঙ্কার,* হেমচন্দ্র সূরী, *সায়ণ মাধবীয় সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ,* সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক অনুবাদ থেকে উদ্ধৃত, পৃষ্ঠা ৭৮।

[১৮] "তপঃস্বাধ্যায়েশ্বর প্রণিধানানি ক্রিয়াযোগঃ", *যোগসূত্র,* মহর্ষি পতঞ্জলি, *পাতঞ্জল দর্শন,* শ্রীপূর্ণচন্দ্র শর্ম্মা কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ৮৭।

করা গেলেও বলা যেতে পারে জীবন জিজ্ঞাসাকেন্দ্রিক আলোচনায় এবং দুঃখ নিবৃত্তির ক্ষেত্রে উপায় এবং লক্ষ্যরূপে ঈশ্বর বিষয়ক আলোচনা তাৎপর্য্যপূর্ণ।

উপরিউক্ত আলোচনার সাথে সঙ্গতি রেখে যেকথা বলা যায় তা হল, ভারতীয় বিভিন্ন দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মতভেদ থাকা সত্ত্বেও, এক অভিন্ন লক্ষ্যকে ধারণ করে মানব জাতিকে দুঃখের বাস্তবতার মুখোমুখি করে, আবার দুঃখ মুক্তির দিশাও নির্দেশ করে। মানব জীবন যে দুঃখে জর্জরিত তা কোনভাবেই ভারতীয় দর্শনে অস্বীকৃত হয়নি। সেই সত্যকে স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্য দিয়েই ভারতীয় দর্শন নানা মত, নানা পথ অনুসন্ধানের মাধ্যমে উপলব্ধি করেছে যে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই জীবনের চরম লক্ষ্য। এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে কোথাও জ্ঞান, কোথাও কর্ম, কোথাও ঈশ্বরকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন যেসকল দর্শন সম্প্রদায় ঈশ্বরকে স্বীকার করেন তাঁরা দুঃখ মুক্তির পথে ঈশ্বরের করুণা ও আশ্রয়কে অনিবার্য বলে মনে করেন, আবার যেসকল দর্শনে ঈশ্বর অস্বীকৃত তাঁরা দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পেতে আত্মশুদ্ধির পথ দেখান। ফলত উক্ত আলোচনায় ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায়গুলির মধ্যে আপাত বিরোধ পরিলক্ষিত হলেও মূল উদ্দেশ্য মানুষকে পরম কল্যাণ ও মুক্তিলাভের পথে পরিচালিত করা। এই মুক্তি কেবল পার্থিব কষ্টের অবসান নয়, বরং এক শান্ত, সুখময় এবং চিরমুক্ত অবস্থার প্রতীক।

## গ্রন্থপঞ্জি:


১. ন্যায়সূত্র (গৌতম), (প্রথম খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ, (২০০৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

২. প্রশস্তপাদভাষ্যম্ (প্রশস্তপাদাচার্য), ব্রহ্মচারী মেধাচৈতন্য দণ্ডিস্বামী দামোদর আশ্রম কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০১৭), কলকাতা: দামোদর আশ্রম।

৩. বাৎস্যায়নভাষ্য (বাৎস্যায়ন), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ (প্রথমখণ্ড), (২০১৪), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৪. বৈশেষিকসূত্র (মহর্ষি কণাদ), প্রদ্যোত কুমার মণ্ডল কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৪), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

৫. মীমাংসাসূত্র (জৈমিনি), ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, (২০০৬), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

৬. সাংখ্যকারিকা (ঈশ্বরকৃষ্ণ), শ্রী পূর্ণচন্দ্র বেদান্তচুঞ্চু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৭), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৭. সর্বদর্শন সংগ্রহ (সায়ন মাধবীয়), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৪০৭), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।


## ইংরেজী গ্রন্থ:


1. Chatterjee, S.C. and Dutta, D.M. *An Introduction to Indian Philosophy.* (2016), New Delhi: Motilal Banarsi Dass.
2. Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy.* (Vol. I- V), (1969), Cambridge University Press.
3. Raju, P.T. *The Philosophical Traditions of India.* (2009), Delhi: MLBD Publishers.
4. Sinha, Jadunath. *Indian philosophy.* (Vol. I & II), (2015) Delhi: MLBD Publishers.
5. Sharma, C.D. *A critical survey of Indian philosophy.* (2000), Delhi: MLBD Publishers.


## সহায়ক গ্রন্থ


১. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। লোকায়ত দর্শন। (২০১৯), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

২. চট্টোপাধ্যায়, লতিকা। চার্বাক দর্শন। (২০১৫), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

৩. দাশগুপ্ত, সুরেন্দ্রনাথ। ভারতীয় দর্শনের ভূমিকা। (২০০৪), কলকাতা: চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড।

৪. ভট্টাচার্য্য, সুখময়। পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন। (১৯৮৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৫. বসু, চারুচন্দ্র। ধম্মপদ। (২০২০), কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

৬. শ্রীযোগেন্দ্রনাথ তর্ক সাংখ্যবেদান্ততীর্থ, ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের সমন্বয়। (২০১৩), কলকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।